ইরানের আধুনিক কবি ওস্তাদ শাহরিয়ার

ড. মোঃ মুহসীন উদ্দীন মিয়া

ইরানের সমকালীন কাব্য জগতে যে কয়জন কবির বহুমুখী কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ মুহাম্মাদ হুসাইন শাহরিয়ার ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন ইরানের রীতিসিদ্ধ ও আধুনিক ধারার যুগসন্ধিক্ষণের কবি । সনাতনী ধারায় কবিতা রচনায় যেমনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত তেমনি মুক্ত কবিতা রচনায় ছিলেন পারঙ্গম। তুর্কি ভাষায় 'হেইদার বাবায়ে সালাম' শিরোনামের কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে ঈর্ষণীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ ছাড়া যেনদানে 'যেন্দেগী' (জীবনের কারাগার), 'দাসতাম বে দামানাত (তোমার আঁচলের উপর আমার হাত), 'হালা চেরা?' (এখন কেন?) 'কারগাহে অদামসাযি' (মানুষ তৈরির কারখানা), 'হাতেম ভা দারভিশান' (হাতেম ও দরবেশগণ) ইত্যাদির ন্যায় অসংখ্য ফারসি কবিতা লিখে সমভাবে সুনাম অর্জন করেছেন।

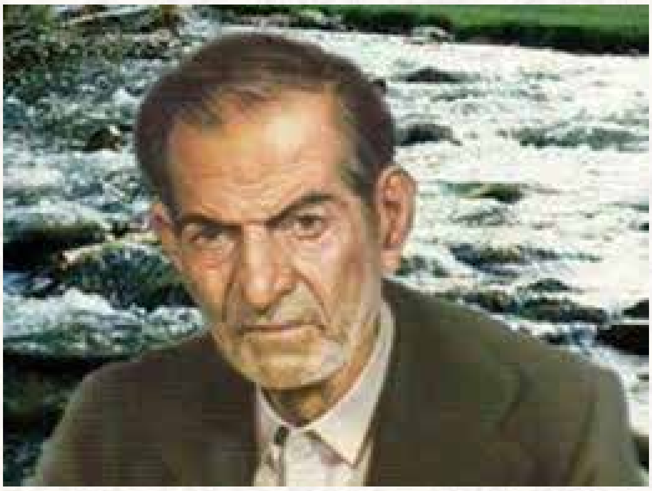

তাঁর পুরো নাম হল সাইয়্যেদ মুহম্মাদ হুসাইন বেহজাত তাবরিযী। তাঁর প্রথম দিককার কবি বা ছদ্মনাম হলো বেহজাত। পরবর্তী সময়ে তিনি মহাকবি হাফিজের দিভান (কাব্যসমগ্র) থেকে ফাল (ভাগ্য গণনা) গ্রহণ করে কাব্যনাম শাহরিয়ার ধারণ করেন। আজও তিনি এই শাহরিয়ার নামেই পরিচিত। জনশ্রুতি আছে যে, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাইয়্যেদ আবুল কাশেম তাঁকে একটি নতুন কাব্যনাম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে হাফিজের অনুরক্ত শাহরিয়ার হাফিজের দিভান থেকে ফাল গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ওজু করে মনোবাসনা পূরণের নিয়তে চোখ বন্ধ করে হাফিজের দিভান খুললেন। অতঃপর কবিতার ইঙ্গিতবহ দুটি চরণ তাঁর জন্য বেরিয়ে এলো। যেমন:

دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل
که چرخ سکه ی دولت به نام شهر باران زد

হে হৃদয়, চলমান জীবন আর রাজত্বের তরে দয়াময় প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর,

কেননা সবসময় সৌভাগ্যের মুদ্রা বাদশাহদের নামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

'শাহরিয়ার' নামটি পাবার পর তিনি এ নামটি গ্রহণ করবেন কী করবেন না এ নিয়ে দোদুল্যমান হয়ে পড়েন। আবারও চোখ বন্ধ করে হাফিজের দীভান খুললেন, এবারও তাঁর জন্য সেই ইঙ্গিতবহ নাম সম্বলিত কবিতাই বের হয়ে এল। যেমন:

غم غریبی و غربت چو بر نمی تایم
به شهر خود روم شهریار خود باشم

অচেনা ও অজানার দুশ্চিন্তা যেহেতু আমাকে উজ্জীবিত করেনি
তাই নিজ শহরে যাবো এবং নিজের বাদশাহ হবো।
উল্লিখিত পঙক্তি থেকেই তিনি শাহরিয়ার' নামটি ভণিতা হিসেবে গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, শাহরিয়ার শব্দের অর্থ হলো বাদশা।

শাহরিয়ার ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইরানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ও পূর্ব আজারবাইজানে প্রাদেশিক রাজধানী তাব্রিজের খোশনাব অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পীর আগা সাইয়্যেদ ইসমাঈল মুসাভি খোশগুনাবি ছিলেন তাব্রিজের একজন আইনজ্ঞ ও উঁচুমাপের শিক্ষাবিদ। এ ছাড়া তিনি কাজার বংশীয় যুবরাজদের সহপাঠী ছিলেন।

শাহরিয়ার তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবনের প্রাথমিক ১৪ বছর নিজ মাতৃভূমি তাব্রিজ শহরে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তিনি তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

সময় তিনি তাঁর প্রাইভেট শিক্ষকদের কাছে ও মাদ্রাসাতে তালাবিয়ায় ও ফেরদৌসিতে ফারসি, আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং হস্তলিপি বিদ্যা অর্জন করেন।

১৯৯১ সালে ১৬ বছর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তেহরান গমন করেন এবং চাচার বাসায় থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যান। তেহরানের তৎকালীন বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল ফুনুনে ভর্তি হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেন।

১৯৯২ সালে ১৯ বছর বয়সে তিনি একই বিদ্যাপীঠের চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। এখানে ৫ বৎসর অধ্যয়ন শেষে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার জন্য ১৯২৭ সালে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু একদিকে অর্থ কষ্ট এবং অন্যদিকে সুরাইয়া নামের এক তরুণীর প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়ার কারণে মেডিকেলের উচ্চতর ডিগ্রি নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি; এমনকি সুরাইয়ার সাথেও তাঁর পরিণয় ঘটেনি। প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার গানি তাঁর উজ্জ্বল জীবনকে অন্ধকারে ঢেকে দেয়। তিনি বলতেন, 'আমি যখন ডাক্তাদের সাথে অস্ত্রোপাচারে অংশ নিতাম, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে সেলাই করে জোড়া দিতাম, তখন আমার হৃদয়-মন দুর্বল হয়ে যেত।'

দারুল ফুনুনে অধ্যয়নকালে তিনি মালেকুশ শোয়ারা বাহার, লুৎফুল্লাহ যাহেদি, আবুল হাসান সাথী, হাবিব সেফারি, ওস্তাদ ওয়ায়েযি, কারখি ইয়াজদি, আমিরি, ফিরোজ কুহি, আরেফ কাযবিনি, মিরযাদে এশকি, ইরাজ মীর্জা প্রমুখ বিখ্যাত কবির সাথে পরিচিত হন। এ সকল কবির দ্বারা পরিচালিত কবিতার আসর ও প্রতিযোগিতাসমূহে তিনি নিয়মিত অংশ নিতেন। রেজা খানের শাসন আমলে সাইয়্যেদ হাসান মুদাররেসের সাহচর্যের প্রভাবে তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। লেখাপড়া ছেড়ে দেয়ার পর তিনি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তেহরানের সরকারি দলিল রেজিস্ট্রি অফিসে চাকুরিতে যোগদান করেন। কিছুদিন পর নিশাপুরে বদলি হয়ে তিনি মাশহাদে চলে আসেন। ১৯৩৫ সালে পুনরায় তেহরানে প্রত্যাবর্তন করে পৌরসভার জনস্বাস্থ্য পরিদর্শক পদে নিয়োজিত হন। এরপর ১৯৩৬ সালে কৃষি ব্যাংকে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে তাঁর পিতা এবং পনের বছর পর ১৯৫২ সালে তাঁর মা ইন্তেকাল করেন। মাতৃবিয়োগের পর তিনি প্রচণ্ডভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন এবং ১৯৫৩ সালের দিকে তাব্রিজে ফিরে আসেন। অবসর গ্রহণের পর কৃষি ব্যাংক থেকে যে সামান্য পেনশন পেতেন তা দিয়ে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই কষ্টের জীবনের কথা তিনি তার দিনের সূচনাতে 'মুমিয়ায়ী' (মমি) নামক কবিতায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

১৯৬৭ সালে আজারবাইজান বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য হুশাঙ্গ আনছারি দেশ ও সাহিত্যে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে ওস্তাদ (শিক্ষক) উপাধি দেন। একই সাথে পূর্ব আজারবাইজানের প্রাদেশিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ঐ দিনটিকে 'শাহরিয়ার দিবস' ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বার্ধক্যজনিত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লে শাহরিয়ারকে তেহরানে চিকিৎসার জন্য আনা হয় এবং চিকিৎসারত অবস্থায় ৮২ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর লাশ তাব্রিজ শহরে এনে মাকবারাতুশ শোয়ারা তথা কবিদের গোরস্তানে দাফন করা হয়।

শাহরিয়ারের কাব্য প্রতিভা

শাহরিয়ার চার বছর বয়স থেকে কবিতা রচনা শুরু করেন। রুহে পিরভানে' (প্রজাপতির আত্মা) শিরোনামে তার প্রথম দ্বিপদি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমেই কাব্যপ্রেমীদের কাছে তিনি সমাদৃত হন। তার সমসাময়িক কালের খ্যাতিমান কবি মালেকুশ শোয়ারা বাহার ও সায়ীদ নাফিসির ভুমিকা সম্বলিত এ কাব্যগ্রন্থটি ১৯৩১ সালে প্রকাশ পায়। এ প্রসংগে মালেকুশ শোহারা বাহার 'সেদায়ে খোদা (খোদার আহ্বান) কাব্যগ্রন্থে শাহরিয়ারকে প্রাচ্যের গৌরব বলে অভিহিত করেন।

শাহরিয়ার মাতৃভাষা তুর্কি ও ফারসিতে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। ১৯৯৮ সালে কাসিদা, গজল, মাসনাভি এবং কেতয়া সম্বলিত প্রায় ত্রিশ হাজার শ্লোক সম্বলিত তাঁর কাব্যসমগ্র 'দিভানে শাহরিয়ার' নামে প্রকাশিত হয়। ত্রিশ হাজার শ্লোকবিশিষ্ট এ কাব্যসমগ্রটি চার খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং এর তিন হাজার শ্লোক ছিল তার মাতৃভাষা তুর্কিতে আর অবশিষ্ট সবই ছিল ফারসিতে রচিত।

তাঁর কাব্যসমগ্র পর্যালোচনা করলে এতে কবিতা রচনার বেশ কয়েকটি ধারা বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন ইরানের সাহিত্যাঙ্গনের ক্লাসিক ধারা হতে আধুনিক ধারায় প্রত্যাবর্তনের যুগ সন্ধিক্ষণের কবি। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ক্লাসিক ধারার কবিতা রচনা করতেন। বলা হয়ে থাকে, তাঁর মাধ্যমেই এ ধারার কবিতা রচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। সমসাময়িক কালে তাঁর সমকক্ষ কাব্য প্রতিভা খুঁজে পাওয়া নিতান্তই কঠিন ছিল। সনাতন ধারায় কাব্যচর্চার প্রতি তাঁর এ আসক্তি মূলত মহাকবি হাফিজের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থেকেই জন্মেছে। শৈশবে দিনে হাফিজ পড়তে পড়তেই হাফিজের প্রতি তাঁর অনুরাগের সৃষ্টি হয়। এ প্রসংগে তিনি নিজেই বলেন, 'আমি ছোট বেলায় একদিকে যেমন প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতাম অন্যদিকে হাফিজের দিভানও পড়তাম। আমি পবিত্র কুরআনের পাশেই হাফিজের দিভান রাখতাম। হাফিজ যেমন তাঁর কবিতার প্রেরণা প্রসংগে বলেছেন,

هرجه کردم از دولت قرآن کردم

অর্থাৎ আমি যা কিছু করেছি, সবই পবিত্র কুরআন থেকেই করেছি। শাহরিয়ার তাঁরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন।

هرجه دارم از دولت حافظ دارم

অর্থাৎ আমার যা কিছু অর্জন সবই হাফিজ থেকে।'

তিনি 'বারগাহে হাফে' (হাফিজের দরবার), 'হাফেযে জাভেদান' (চিরন্তন হাফিজ), 'ভেসালে হাফেয' (হাফিজের মিলন) নামক কবিতা লিখে হাফিজের প্রতি তাঁর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এ কারণেই তিনি হাফিজ শিরাযির পাচশ গজলের অনুকরণে নিজস্ব কল্পনা ও অভিব্যক্তির সম্মিলনে শত গজল রচনা করেছেন-যা পাঠ করলে মনে হবে এ যুগে বসেও হাফিজের সাথেই ভাবের আদান-প্রদান করা হচ্ছে। আরো মনে হবে হাফিজের

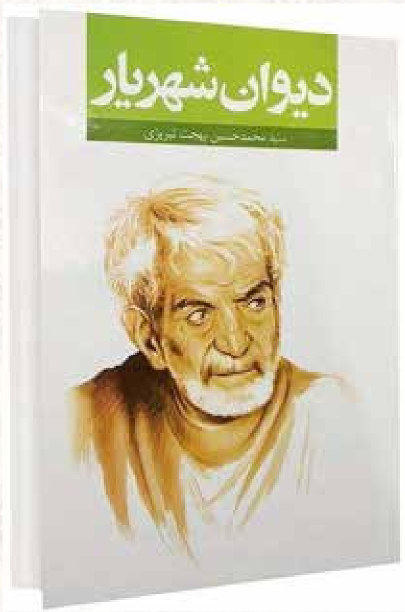

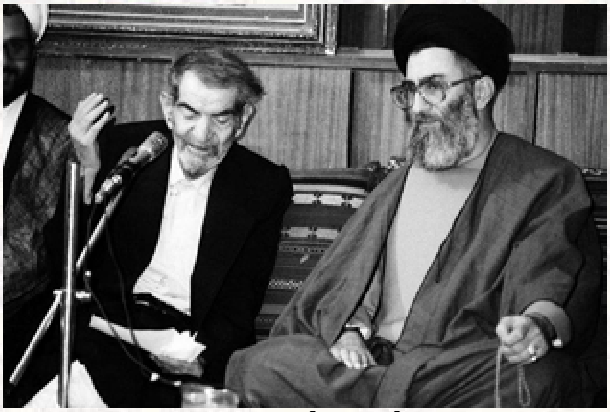

রাহবার সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর সাথে

গজলেরই প্রতিউত্তরে এ গজলগুলো রচিত হয়েছে। 'হাতেম ভা দারভিশান' (হাতেম ও দরবেশগণ), 'বাদে ভাহাদাত' (একত্ববাদের সমীরণ), 'কারগাহে অদামসাযি (মানুষ তৈরির কারখানা) শিরোনামের কবিতাগুলোর উপজীব্য বিষয়, অভিব্যক্তি, মরমি ভাবধারা এবং । শিল্পগুণ– এ সবই হাফিজের গজলের অনুসৃত বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন:

آسمان خود خبر از عالم درویشان است
که کمر بسته به خدمت خم درویشان است
نیست جز بی خبری در همه عالم خبری
که خبرها همه در عالم درویشان است

দরবেশ জগতের খবর হয় নিজস্ব আকাশে উদ্ভাসিত,
ন্যুজ দরবেশগণ সেবায় কোমর বেঁধেছে।
সারা দুনিয়ার সংবাদে খবরহীনতা ভিন্ন নেই কিছু
কেবল দরবেশগণের সংবাদেই হয় জগত পূর্ণ।

এমনকি কবিতা সম্মেলন উপলক্ষ্যে শিরায নগরীতে অবস্থানকালে শাহরিয়ারের রাতগুলো কেটেছিল হাফিজের মাজারে। সেখানে হাফিজের সামাধি থেকে তিনি আত্মিক প্রেরণা লাভ করেছেন। বিদায় বেলায় একটি আবেগময়ী গজল লিখে হাফিজের কাছ থেকে বিদায় নেন। সেই গজলের দু'টি চরণ ছিল এই রূপ:

به تودیع تو جان می خواهد از تن شد جدا حافظ
به جان کندن وداعت می کنم حافظ، خدا حافظ

তোমাকে বিদায় দিতে আমার প্রাণ ছিন্ন হতে চায় দেহ থেকে

হে হাফিজ! প্রাণটা ছিন্ন করেই তোমাকে জানাই বিদায়, খোদা হাফেজ।

শাহরিয়ার শৈশব থেকেই জীবনের পূর্ণতা ও সঠিক দিকনির্দেশনা লাভে পবিত্র কুরআনের সাথে গভীরভাবে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। নিজেকে সর্বদা পবিত্র কুরআনের কাছে ঋণী মনে করতেন। তিনি বলেন: 'আমি যে সামান্য সাহিত্য সেবা করার সুযোগ পেয়েছি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমি ৬ বছর বয়স হতেই পবিত্র কুরআন পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলি। সে বয়সেই আমি দেখে দেখে পবিত্র কুরআন পড়তে শিখি। আমার ঘরে একটি তাক ছিল যাতে সর্বদাই রাখা হত এক খণ্ড কুরআন ও হাফিজের দিভান। বাহির থেকে ঘরে ফিরে এসে একবার পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতাম আরেকবার পড়তাম দিভানে হাফেজ। ঐশী বাণীর কাব্য ঝংকারের সাথে হাফিজের কবিতার ছন্দোবদ্ধ সুর আমার চিন্তা জগতে দারুণভাবে নাড়া দিত। যেমন তিনি বলেন:

به شمع صبحدم شهریار و قرآنش
کزین ترانه به مرغان صبح خوان مانم

হে শাহরিয়ার! প্রভাতের প্রদীপ আর পবিত্র কুরআনের শপথ
এই সুর ও ছন্দের দ্যোতনায় ভোরের গায়ক পাখির সাথে তুলনীয় আমি।

পরবর্তী সময় ১৯৪১ সালে রেজাশাহ পাহলভী ও তার সন্তান মুহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভীর ক্ষমতার পটপরিবর্তনের ঘটনা শাহরিয়ারের মনে গভীর রেখাপাত করে। এ সময় থেকেই তিনি বৈষয়িক সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রদর্শিত জীবনবিধানের সাথে আত্মার বন্ধন গড়ে তোলেন। এমনকি তাঁর ধর্মানুরাগ তাঁকে সেতার বাজানো থেকেও বিরত রাখে। তিনি বলেন, 'আসলেই মানুষের আল্লাহ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি আল্লাহর সান্নিধ্য হতে বিচ্ছিন্ন না হয় তবে আল্লাহ নিজেই মানুষের হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার করেন।'

তাঁর মতে কবিরা হলেন পয়গাম্বরদের চাইতে একস্তরের নিচের মর্যাদায় আসীন। নবিগণের কাছে আল্লাহর ওহী (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হয় আর কবিগণের কাছে আসে ইলহাম (ভাবসঞ্চার)। তবে শর্ত হচ্ছে কবিতার পুরোটাই হতে হবে তাওহীদভিত্তিক বা আল্লাহর একত্বের অভিব্যক্তি।

এ প্রসংগে তিনি বলেন:

غلام همت آن قهرمان کون و مکان
که بی رضای الهی نمی زند تفسی

(শাহরিয়ার) সৃষ্টি জগতের সেই অদম্য সাহসী বীরের গোলাম
যে কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া একটি নিঃশ্বাসও নেয় না।
এরপর থেকে তাঁর দিনে স্থান পেতে থাকে আধ্যাত্মিকতা সঞ্জাত ধর্মীয় কবিতাসমূহ।

যেমন: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা, মহানবী (সা.)-এর প্রশস্তি, খোদার কাছে প্রার্থনা ও আহলে বাইতের গুণগান। মহান আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে শাহরিয়ার তাঁর মোনাজাত' কবিতায় বলেন:

دلم جواب بلی می دهد صدای تو را
صلا بزن که به جان می خرم بلای ترا
شبانیم هوس است و طواف کعبه ی طور
مگر به گوش دلی بشنوم صدای تو را

তোমার ডাকে হৃদয় মোর 'হ্যা' বলে দেয় সাড়া।
ডাকো মোরে বার বার প্রাণের বিনিময়ে ক্রয় করবো যত দুর্দশা

রাখালের ন্যায় কামনা মোর কাবার তুর তাওয়াফের তরে
কিন্তু হৃদয়ে বার বার শুনি তোমার ধ্বনি।

মহানবী (সা.)-এর প্রশস্তি রচনায় 'কেয়ামে মুহাম্মাদ' নামক কবিতায় বলেন:

ستون عرش خدا قایم از قیام محمد (ص)
ببین که سر به کجا می کشد مقام محمد (ص)
به کارنامه ي منشور آسماني قرآن
که نقش مهر نبوت بود به نام محمد (ص)

আল্লাহর আরশের খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে মুহাম্মাদের আবির্ভাবে
তাকিয়ে দেখ, কোথায় পৌঁছেছে মুহাম্মাদের মর্যাদা
আসমানে প্রকাশিত কুরআন নামের আমল নামায়
মুহাম্মাদের নামই ছিল নবুয়্যতের মোহারাংকিত।

আহলে বাইত বা নবী-পরিবারকে নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি হযরত আলী (আ.)-এর সম্পর্কে অপর এক কবিতায় বলেন :

علي اي هماي رحمت تو چه آيتی خدارا
که به ماسر افکندی همه سايه ی همارا

হে আলী তুমি রহমতের পাখিতুল্য, কি অপূর্ব নিদর্শন তুমি খোদার
আল্লাহ ছাড়া সবকিছুকে ছুড়ে ফেলেছো তুমি, এমনকি সৌভাগ্যের ছায়াকেও।

তিনি অন্যত্র বলেন:

اي مظهر جمال و جلال خدا علي
يا مظهر العجايب و يا مرتضي علی
از شهريار پير زمينگير دست گير
اي رتگير مردم بی دست و پا علی

হে আল্লাহর সৌন্দর্য ও মহিমার প্রকাশ আলী,
হে বিস্ময়ের প্রকাশস্থল মুরতাজা আলী।
ভূলুণ্ঠিত বৃদ্ধ শাহরিয়ারের হাত ধরে তরিয়ে নাও,
ওহে হাত-পা-শুন্য অসহায় মানুষের দরদী বন্ধু আলী।

তাঁর কবিতা দর্শন, নৈতিকতা ও মানবতার জয়গানে পরিপূর্ণ। তাই তাঁর চিরায়ত সাহিত্যকর্ম কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। মহাকবি সাদি, হাফিজ ও রুমির প্রেমগীতির আধুনিক স্লোগান হিসেবে ধরা দিয়েছে শাহরিয়ারের কবিতাবলি। মানবতা ও সভ্যতার সকল সৌকর্যে পরিপূর্ণ শাহরিয়ারের কবিতা। তাঁর অসংখ্য জীবনঘনিষ্ঠ প্রেমময় গজল ভাষার দুর্বোদ্ধতা এড়িয়ে সাধারণ মানুষের কাছে অতি সহজে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, নিজস্ব চিন্তা-কল্পনা ও ভাবধারা তাঁর কবিতায় নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছে। শাহরিয়ার সংগীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি নিজে ইরানি মিউজিক সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং সেতার বাজাতে পারঙ্গম ছিলেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন:

آنچه ديدم از نواي زندگي نامبتذل
ناله سيم سه تارم بود و ديوان غزل

জীবনের নিষ্কলুষ হৃদয় নিঃসৃত সুরে যা কিছু দেখেছি,
তা ছিল আমার সেতারের ক্রন্দন আর গজলের দিন।

আরেকটি গজলে তিনি সেতারকে ব্যথিত হৃদয়ের সাথি ও শান্তিদায়ক বলে বর্ণনা করেন:

نالد به حال زار من امشب سه تار من
این مایه تسلي شبهاي تار من

ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করতে আজ কাঁদছে আমার সিতার খানি
আমার নিকষ কালো রাতগুলোতে সান্ত্বনার মূলে ছিলো এটি।

মহাকবি হাফিজের প্রেম মদিরার ফলগুধারা শাহরিয়ারের কাব্যেও প্রবহমান ছিল। কেননা, প্রেমই বিশ্বলোকের প্রাণশক্তি। শাহরিয়ার নারীপ্রেম দিয়েই তাঁর কাব্য শুরু করে পরিশেষে সত্যিকারের প্রেমের সন্ধান লাভ করেন।

যেমন তিনি বলেন:

نقش مزار من کشید این دو سخن که شهريار
با غم عشق زاده و با غم عشق داده جان

মোর মাযারে লিখে রেখো বন্ধু এ দু'কথার স্লোগান
প্রেমের ধ্যানে জন্মেছে শাহরিয়ার, প্রেমেই দিয়েছে প্রাণ।

অন্যত্র তিনি বলেন :

عشق ای همسایه آوارگی
عشق ای سرمایه بیچارگی
راحت از بار غم دل کن مرا
یا بکش یکباره با ول کن مرا

প্রেম: হে ভবঘুরে প্রতিবেশী আমার
প্রেম হে অসহায়ত্বের পুঁজি আমার
অন্তরের চিন্তার বোঝা থেকে আমায় মুক্তি দাও
একবারে হত্যা কর অথবা ছেড়ে দাও আমায়।

তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেমের গজলগুলো হচ্ছে 'এন্তেজার' (অপেক্ষা)

কবি শাহরিয়ারের সমাধিক্ষেত্র

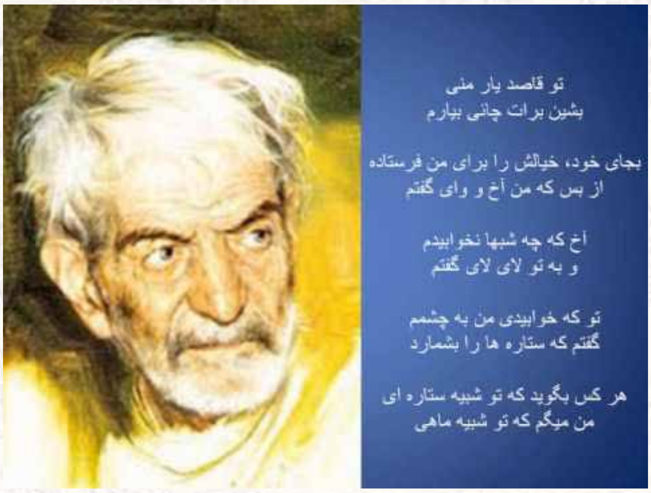

'জাম ভা তাফরীক' (সমন্বিত ও বিচ্ছিন্নতা), 'ভাহশী শেকার' (হিংস্র পশু শিকার), 'ইউসুফ গোমগাশতে' (হারানো ইউসুফ), 'মোসাফিরে হামেদান' (হামেদানের পথিক), 'হারাজে এশক' (প্রেমের নিলাম) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শাহরিয়ার রীতিসিদ্ধ কবিতার পাশাপাশি মুক্ত কবিতা বা শেরে আযাদ রচনা করেছেন সাবলীলভাবে। তাঁর মুক্ত কবিতাগুলো অধিকাংশই ইরানের আধুনিক কাব্যের জনক নিমা ইউসিজের আফসানে'-এর (রূপকথা) আদলেই রচিত। বলা যায়, এক্ষেত্রে তিনি নিমায়ী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নিমা আধুনিক কবিতার আঙ্গিক বিনির্মাণের লক্ষ্যে তাঁর সংক্ষিপ্ত কবি জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার দীর্ঘ কঠিন পথের চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর বিখ্যাত 'আফসানে' শীর্ষক কবিতায়। এ কবিতা রচনার মধ্য দিয়েই মূলত আধুনিক একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাহরিয়ার যদিও তাঁর কবি জীবনের সূচনা করেছেন ক্লাসিক ধারার কবিতা রচনার মাধ্যমে। যদিও মাঝ পথে এসে তিনি অর্ধ রীতিসিদ্ধ। কবিতা রচনা শুরু করেন- ফারসিতে যাকে বলে 'নিমে সুন্নাতি'। এ ধরনের কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'হাযিয়ানে দেল' (অন্তরের অর্থহীন প্রলাপ), 'দো মোরগে বেহেশতি' (স্বর্গের দুই পাখি), 'সারনেভেশতে এশক' (প্রেমের ভাগ্যলিপি), 'রায ভানিয়ায (রহস্য ও প্রয়োজন) ইত্যাদি। তার আধুনিক কবিতার ভাবধারা নিমায়ী ভাবধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও রং ও ভঙ্গিমা ছিল একান্ত নিজস্ব। কেননা, এ কবিতাগুলোর বিষয় নির্বাচন ও কল্পচিত্র তৈরিতে তিনি সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। তাঁর আধুনিক ধারার উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হচ্ছে 'এই ভায়াইয়ে মাদারাম' (হায়রে আমার মা), 'অফসানেয়ে শাব' (রাতের রূপকথা), 'হাযিয়ানে দেল' (অন্তরের অর্থহীন প্রলাপ), 'মুমিয়ায়ী' (মমি) ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ তাঁর রচিত একটি আধুনিক কবিতার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো:

در شبستان خود پای شمعی
شاعر مات و محزون نشسته
دیرگاهی است کاین کلیه را در
بر رخ یار و اغیار بسته
گرد اندوه باریده اینجا
می نماید همه چیز خسته
دفتری پیشش است و سه تاری

নিজ কক্ষে মৃদু আলোর মোমবাতির সন্নিকটে
বিষণ্নমনা ও চিন্তাক্লিষ্ট কোনো এক কবি একাকী বসে আছে
বহুকাল হতে ছোট সে কুটিরের দরজা
বন্ধুর মুখের উপর হয়েছে বন্ধ
দুশ্চিন্তার ধূলোরাশি প্রতিনিয়ত বর্ষিত হয় এখানে
সব কিছুই ক্লান্তিকর করে তোলে, আর
তার কাছে রয়েছে একটি খাতা ও একটি সেতার।

নিজ মাতৃভাষা তুর্কি অযারি ভাষায় তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি হচ্ছে 'হেইদার বাবায়ে সালাম' (সালাম হায়দারবাবা)। হায়দরবাবা তাঁর গ্রামের অদূরে পাহাড়ের একটি নাম। কবি শৈশবের স্বপ্নের দিনগুলোতে তাঁর গ্রামের পাহাড়ঘেরা প্রকৃতির সাথে আত্মার যে কথোপকথন বা ভাব বিনিময় করেছেন তা-ই কবিতায় সালাম হায়দার বাবা নামে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিতাটি কেবল তুর্কি ভাষাতেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে প্রায় সত্তরের অধিক ভাষাতে অনূদিত হয়েছে। পয়ার ছন্দে লেখা এই কবিতার ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। তুর্কি ভাষায় তাঁর দক্ষতার জ্বলন্ত সাক্ষ বহন করে এ কবিতাটি। তুর্কি ভাষাভাষী এমন কোন শিক্ষিত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি তুর্কি জানেন অথচ এ কবিতা পড়ে ভাষার লালিত্যে মোহিত হননি।

قاری که گنجه تاغیل دلیندە
کولک قالخوب قاب یجائی توینذه
قورد گچنین ستگیلین یئیتده
من قابلدوب بیرده لوشاق لولبدیم

হেইদার বাবা মনে পড়ে কি আজি সেই রাতের কথা
যে রাতে বৃদ্ধ দাদীমা নানা কাহিনী বলতেন
ঝড়ো বাতাস জানালা-দরজাকে ঝাঁকুনি দিত
ক্ষুধার্ত নেকড়ে দল ছাগল দলের ওপর হানা দিত
আফসোস যদি আমি এক মুহূর্তের তরে ফিরে যেতে পারতাম সেই শৈশবে ....

শাহরিয়ারের স্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলো পাঠক মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। 'শিভানে শাহরিভার' (শাহরিভার মাসের শোকগাথা), 'মেহমানে শাহরিভার' (শাহরিভার মাসের অতিথি), 'শাবিখুন' (রক্তাক্ত রজনী) প্রভৃতি কবিতা তাঁর স্বদেশপ্রেমের অন্যতম নিদর্শন। তিনি ইসলামি বিপ্লবের একজন খাঁটি সমর্থক ছিলেন। শোষকের বিরুদ্ধে মজলুম ও বঞ্চিতদের প্রতিরোধ আন্দোলনই ছিল তাঁর কবিতার প্রাণশক্তি। যে কারণে কবি শাহরিয়ারের নাম ফারসি সাহিত্যাঙ্গনে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

লেখক : অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ফারসি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের গুরুত্ব

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

হাল জামানায় দ্বিতীয় প্রজন্মের শিক্ষিত লোকেরা কাগজে লিখেন না। তাঁরা সরাসরি টাইপ করেন কম্পিউটারের স্ক্রীনে। আমরা যারা প্রথম প্রজন্মের লোক, আমাদের মধ্যে ভালো ভালো লেখকদেরও দেখা যায়, লিখতে গিয়ে তাঁদের বিড়ম্বনার শেষ নেই। কারণ হলো, দিনদিন কাগজ-কলমের চর্চা অচল হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা আশংকায় থাকেন, কখন তাঁদের দিনকাল অচল হয়ে যায়।

প্রাইমারিতে পড়ার সময় দ্বিতীয় শ্রেণিতে ওঠার পর আমরা জামার পকেটে কালি লাগাতাম। উদ্দেশ্য বিদ্যার দৌড়ের কথা জানান দেওয়া। কারণ, এর আগে লিখতে হতো স্লেটে খড়িমাটি দিয়ে। তারও আগে দোয়াতের কালিতে বাঁশের কঞ্চি চুবিয়ে অ আ ক খ লিখতে হতো শিল্পীর দক্ষতায়।

বই-পুস্তক প্রকাশনায় কম্পিউটারের চর্চা ব্যাপক হয়েছে বেশিদিন হয় নি। এর আগে কাগজের গায়ে হাতে লেখা হতো কলম কালির বিন্যাসে। সেই লেখা সীসা বা দস্তায় তৈরি অক্ষর খাঁজে বসিয়ে বসিয়ে বইয়ের পাতা আকারে সাজানো হতো। তারপর তা মেশিনে কালির ছাপ দিয়ে ছাপানো হতো। মুদ্রণ শিল্পের আগের ইতিহাস বিচিত্র হলেও মূল কথা হলো, বই-পুস্তক, দলিল-দস্তাবেজ টাইপ বা কম্পোজ করার পরিবর্তে কাগজ বা কাঠ, চামড়া কিংবা অন্য কোনো উপকরণের উপর লেখা হতো। সেই লেখা দেখে দেখে কপি বা অনুলিপি তৈরি করা হতো। এই যে প্রথম লেখা, সেটির নাম পাণ্ডুলিপি। অর্থাৎ লেখকের হাতের মূল লেখা। অনেক সময় কপিকারের অনুলিপিও হাতের লেখা বিধায় পাণ্ডুলিপি বলা হতো বা এখনো বলা হয়।

পঞ্চাশ বছর আগের লেখা বইয়ের কথা চিন্তা করলে ধরে নিতে হবে যে, সে বই কলম-কালি ব্যবহার করে কাগজের গায়ে লেখা হয়েছে। তারপর মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে শত শত বা ইচ্ছামত ছাপা আকারে বের করা হয়েছে। শুধু বই-পুস্তক কেন, জায়গা জমির দলিল, বিয়ের কাবিন, চুক্তিপত্র সবই এ পদ্ধতিতে লিখিত ও সংরক্ষিত হয়েছে।

এই যে বই-পুস্তক, দলিল-দস্তাবেজ, চুক্তিপত্রের কথা বললাম তার হাকিকত কী? হাকিকত হলো, আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের লিখিত সনদ এসব পাণ্ডুলিপি। বর্তমানের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে যদি অতীতের সাগরের রূপ দেখতে চাই তাহলে এসব পাণ্ডুলিপির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আমরা সাধারণত বাপ-দাদার ভিটেমাটিতে বসবাস করি। জমি-জিরাত অধিকাংশ পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া। এই ভিটেমাটি, জামি-জিরাত আমার, তাতে অন্যের মালিকানা নেই, এ কথার প্রমাণ কী? নিশ্চয়ই জমির দলিলপত্র। দলিলপত্র ঠিক না থাকলে জমির মালিকানা বেহাত হবে এ কথা যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বুঝানোর প্রয়োজন হয় না। জমির মালিকানা সাব্যস্ত করতে দলিল-দস্তাবেজের যে গুরুত্ব, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণে প্রাতিষ্ঠানিক সনদ বা সার্টিফিকেটের যে মূল্যমান, জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

একটি দালান টিকে থাকে তার ভিত্তিমূলের উপর। গাছ মাথা তুলে শাখা বিস্তার করে তার মূল বা শিকড়ের উপর ভর করে। একটি জাতিও বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দাবি নিয়ে। যে গাছের শিকড় শক্ত মাটির গভীরে প্রোথিত নয় সেটি সামান্য ঝড়ের ঝাপটায় কুপোকাত হয়ে পড়ে। যে জাতির পেছনের ইতিহাস জানা নেই, দুই একশ বছর বা পাঁচ সাতশ বছরের আগে কোথায় কী হয়েছিল জানা নেই, বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে সভ্যতার বড়াই করার অধিকার সে জাতির নেই।

এ কারণেই বিশ্বের উন্নত জাতিগুলো ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্নতত্ত্ব গবেষণায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। দেশে বিদেশে খনন কার্য চালায়। তার উপর ইতিহাসের পাঠ তৈরি করার জন্য গবেষকরা জীবন উৎসর্গ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা হয়। জাদুঘরের প্রত্নতত্ত্বের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। এ জন্য পশ্চিমা উপনিবেশবাদীরা এর প্রতি এত লোভী।

আমেরিকার ইরাক আগ্রাসনে বাগদাদের পতন হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ইতিহাসবিদ প্রফেসর আবদুল মমিন চৌধুরী এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বাগদাদের যে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার লুণ্ঠিত হয়েছে, ইউরোপ আমেরিকার সংগ্রহশালায় সেগুলোর খোঁজ পাওয়া যাবে। তার মানে পাণ্ডুলিপিগুলো চোরাই পথে ইউরোপ আমেরিকার সংগ্রহশালায় গিয়ে জমা হয়েছে। কারণ, তারা এর মাধ্যমে একটি জাতির অতীত ও ভবিষ্যতকে জিম্মি করে রাখতে পারে। ভারতবর্ষে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতাও তার চেয়ে ভিন্ন নয়। তাই বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে মৌলিক গবেষণা করতে হলে আমাদের গবেষকদের লন্ডন চলে যেতে হয়।

বাকি অংশ ২৩ পাতায় দেখুন

ফারসি পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত তথ্য আহ্বান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

'আনজুমানে ফারসি বাংলাদেশ' এর পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। একটি বিষয় প্রিয় দেশবাসীর খেদমতে আরজ করতে চাই যে, অতীতে বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষে দীর্ঘ ৬০০ বছর সরকারি অফিস-আদালত ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাষা ছিল মিষ্টি মধুর ভাষা ফারসি। আমাদের পূর্বপুরুষরা তখন ফারসি ভাষার সাথে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা অনায়াসে শেখ সাদী, হাফেয শিরাজী, মওলানা রূমী ও উমর খৈয়ামের বয়েত পড়তেন ও বলতেন। তাঁরা ফারসি ভাষায় বহু কিতাব লিখে গেছেন, যা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্মারক। এখনও মানব জাতির জন্য প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার বাহন এই ফারসি ভাষা আমাদের দেশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিজস্ব উপস্থিতি বজায় রেখেছে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপর লেখাপড়া অনার্স থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যন্ত এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষাকোর্স পর্যায়ে চালু আছে। সারা দেশে হাজারো ছাত্রছাত্রী ফারসি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করছে এবং তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি আলিয়া ও কওমী নেসাবের মাদ্রাসাসমূহে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন সীমিত আকারে হলেও অব্যাহত রয়েছে। অনুরূপভাবে ধর্মীয় মহল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফোরাম এবং জ্ঞানীগুণীদের মহলেও ফারসির প্রতি ভালোবাসা ও আসক্তি বলবৎ রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে 'আনজুমানে ফারসি বাংলাদেশ' দেশ ও জাতির সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং অতীত ও বর্তমানের মাঝে সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রাচীন গ্রন্থাগারসমূহ বা

প্রবীণ গুণী ব্যক্তিদের বাড়িঘরে বিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষিত কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এমন ফারসি ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার চিন্তা করেছে।

এ লক্ষ্যে এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী প্রিয় ভাইবোনদের কাছে জাতির গৌরবদীপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের নিমিত্তে প্রাথমিক পর্যায়ে এ সম্পর্কিত তথ্য ই-মেইল বা ফোনের মাধ্যমে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

১. পাণ্ডুলিপির নাম, লেখকের নাম এবং সম্ভব হলে রচনার তারিখ

২. পাণ্ডুলিপির শুরু ও শেষের পাতা এবং মাঝখানের দু একটি পাতার ফটোকপি বা স্ক্রীনশট।

৩. প্রেরকের বিস্তারিত ঠিকানা (মোবাইল নং, ই-মেইল নং)।

অনুগ্রহ করে যে কোনো ধরনের তথ্যের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আনজুমানে ফারসি বাংলাদেশ
রুম নং ২০৯, ২য় তলা
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ০১৩১৯৩৪৯২১৩
ই-মেইল : anjumanefarsibd@gmail.com

স্মরণীয় দিবস

১ জুলাই : বিশ্ব হস্তশিল্প দিবস।

৩ জুলাই : ১৯৮৮ সালের এ দিনে পারস্য উপসাগরে মার্কিন রণতরী থেকে পরিচালিত ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইরানি এয়ারবাসের তিন শতাধিক যাত্রী শহীদ হন।

৫ জুলাই : বিশ্ব কলম দিবস।

৯ জুলাই : ইরানে শিশু-কিশোর সাহিত্য দিবস হিসেবে পালিত হয়।

১২ জুলাই : ইরানে হিযাব ও সতীত্ব দিবস।

১০ জুলাই : ইমাম তাকী (আ.)-এর শাহাদাত দিবস।

২১ জুলাই : আহলে বাইতের প্রথম ইমাম আলী (আ.) এবং নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (আ.)-এর বিবাহ বার্ষিকী। ইরানে দিবসটি বিবাহ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়।

১৭ জুলাই : আহলে বাইতের পঞ্চম ইমাম বাকের (আ.)-এর শাহাদাত দিবস।

১৯ জুলাই : আরাফাত দিবস (৯ যিলহজ)।

* বিশ্ব স্বেচ্ছায় রক্তদান দিবস।

২০ জুলাই : ঈদুল আযহা বা কোরবানির ঈদ।

২৮ জুলাই : ঈদ-ই গাদীর দিবস। বিদায় হজ থেকে ফেরার সময় মহানবী (সা.) ১৮ যিলহজ হাজীদের সমাবেশে ইমাম আলীকে মহানবীর ওফাত পরবর্তীকালে উম্মতের মাওলা ঘোষণা করেন।

৩ আগস্ট : মহানবী (সা.)-এর সাথে খ্রিস্টান পাদ্রিদের মুবাহিলা দিবস।

৫ আগস্ট : ইসলামি মানবাধিকার ও মানবতা দিবস।

৬ আগস্ট : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী।

৮ আগস্ট : ইরানে সাংবাদিক দিবস।

১১ আগস্ট : হিজরি ১৪৪৩ সাল শুরু।

* ১৯৮১ সালের ৩০ আগস্ট প্রেসিডেন্ট ভবনে গুপ্তঘাতকের পাতা বোমা বিস্ফোরণে শহীদ হন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আলী রাজাই ও প্রধানমন্ত্রী হুজ্জাতুল ইসলাম ড. জাভাদ বাহোনার। দিবসটি সন্ত্রাসবিরোধী দিবস হিসেবে পালিত হয়।

১৫ আগস্ট : বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন।

২০ আগস্ট : পবিত্র আশুরা। ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাত দিবস।

২১ আগস্ট : ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান কর্তৃক ঘোষিত বিশ্ব মসজিদ দিবস।

* আল্লামা মাজলিসী স্মরণে দিবস।

২৩ আগস্ট : বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী বু-আলী সীনা স্মরণে দিবস; ইরানে এ দিনটি চিকিৎসক দিবস হিসেবে পালিত হয়।

২৭ আগস্ট : বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী যাকারিয়া রাযী স্মরণে দিবস; ইরানে এ দিনটি ওষুধ শিল্প দিবস হিসেবে পালিত হয়।

২৯ আগস্ট : বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী।

৪ সেপ্টেম্বর : নবীবংশের চতুর্থ ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর শাহাদাত দিবস।

* বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আবু রায়হান বিরুনী স্মরণে দিবস।

১০ সেপ্টেম্বর : আয়াতুল্লাহ তালেকানী (রহ.)-এর ওফাত দিবস।

১৮ সেপ্টেম্বর : ইরানে কবিতা ও ফারসি সাহিত্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। কবি সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইন শাহরিয়ার স্মরণে দিবস।

২০ সেপ্টেম্বর : বাংলা ভাষার প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিনের মৃত্যুবার্ষিকী।

২২ সেপ্টেম্বর : ইরাকের সাদ্দাম সরকার এদিনে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ইরানের পবিত্র প্রতিরক্ষা যুদ্ধের শুরু।

২৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব পর্যটন দিবস।

৩০ সেপ্টেম্বর : বিশ্ববিখ্যাত মরমি কবি মওলানা জালা-লউদ্দিন রুমির জন্মবার্ষিকী।

* ফিলিস্তিনের শিশু-কিশোরদের সাথে সংহতি প্রকাশের জন্য দিবসটি পালিত হয়।

শিশু-কিশোরদের জন্য

মহান আল্লাহর পরিচয়

গোলাম রেযা হায়দারী আবহুরী
অনুবাদ : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

পশুপাখিদের কথা বলা

‘তোমরা নিজ নিজ বাসায় ঢুকে পড় যাতে সুলায়মান ও তাঁর সৈন্যরা তোমাদেরকে পদদলিত না করেন।’- সূরা নামল : ১৮

পশুপাখিরা আমাদের মানুষদের মতো কথা বলে না। কিন্তু তারাও একে অপরের সাথে কথা বলে থাকে এবং কথোপকথন করে থাকে। দয়াময় আল্লাহ তাদেরকেও এমন উপকরণ দান করেছেন যার মাধ্যমে তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। অবশ্য একেক প্রাণীর অন্যের সাথে কথা বলার ধরনটা একেক রকম। প্রত্যেকেই তার নিজের ভাষায় কথা বলে থাকে। যেমন মৌমাছি যখন নতুন কোনো ফুল খুঁজে পায়, তখন তার বিশেষ পদ্ধতির চলার মাধ্যমে ঐ ফুলের সংবাদটি তার বন্ধুদের জানিয়ে দেয়। এমনকি ঐ চলার মাধ্যমে সে উক্ত ফুলটি কী জাতের এবং মৌচাক থেকে এর দূরত্ব কত সেটাও জানিয়ে দেয়।

পশুপাখিদের আরেক রকমের কথা বলা হলো নিজের চারপাশে গন্ধ ছড়িয়ে দেওয়া। যেমন পিঁপড়া ও উঁইপোকারা যখন তাদের নিকটে শত্রুকে দেখতে পায়, তখন গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে অন্য বন্ধুদের সাবধান করে দেয়। কিংবা বিশেষ এক ধরনের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে বুঝায় যে, রাণীর অবস্থা কেমন আছে।

এমনকি আমরা পশুপাখিদের থেকে এই যে অনর্থক নানা আওয়াজ শুনে থাকি এগুলোরও সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, যা তারা বুঝতে পারে। একজন বিজ্ঞানী রাজহাঁসের ডাক সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং এ ফলাফলে উপনীত হয়েছেন :

রাজহাঁস যখন একাধারে ডাকতে থাকে কিংবা সাতবার পর পর ডাকে, তখন বলে : ‘প্যাক প্যাক’ অর্থাৎ আমাদের বিরক্ত কর না। এখানে আমাদের খাদ্য রয়েছে এবং আমরা ভালোই আছি।

আর যদি কেবল ছয় বার ডাকে তাহলে তার অর্থ হলো ঘাসের মধ্যে আমাদের খাদ্য প্রচুর রয়েছে। ছাড়, আরো কিছু ঘাস খাই এবং আস্তে আস্তে এগুতে থাকি।

যদি পাঁচ বার ডাকে, তাহলে তার অর্থ হলো গতিবেগ কমাতে হবে।

যদি তিন বার ডাকে তাহলে তার অর্থ হলো মনোযোগ দাও, ধীরে ধীরে।

যদি একটি রাজহাঁস বুঝাতে চায় যে, সে উড়তে চাচ্ছে না, বরং সর্বোচ্চ গতিতে হেঁটেই চলতে চায়, তাহলে সে তার আওয়াজের মধ্যে তিন বার ডাকে। তবে এবারে আরো উচ্চৈঃস্বরে ও তীব্রভাবে।

যখন একটি কুকুর রাজহাঁসের নিকটবর্তী হয়, তখন রাজহাঁস ‘রণ’ শব্দ করে অন্যদের সাবধান করে দেয় যে, নিকটে কুকুর রয়েছে।[১]

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ যে, মহান আল্লাহ পশুপাখিদেরও একে অপরের সাথে কথা বলতে পারার নেয়ামত দান করেছেন। আমরা যদিও বলে থাকি ‘অবলা পশু’, কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, তারা একে অপরের সাথে কথা বলতে পারে না।

আরো চমৎকার ব্যাপার হলো পবিত্র কোরআন জীবজন্তুর কথা বলার বিষয়টি সত্যায়িত করেছে। সূরা নামল এর ১৮ নং আয়াতে পিঁপড়াদের একে অন্যের সাথে কথা বলার প্রতি ইশারা করা হয়েছে; যখন হযরত সুলায়মান (আ.) পিঁপড়াদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করলেন, তখন একটি পিঁপড়া অন্য পিঁপড়াদের বলল : ‘তোমরা নিজ নিজ বাসায় ঢুকে পড়, যাতে সুলায়মান ও তাঁর সৈন্যরা তোমাদের পদদলিত না করেন।’ কোরআন পিঁপড়ার এ কথাটি বর্ণনা করেছে। আর ঐ একই সূরার ১৯ নং আয়াতে বলেছে যে, হযরত সুলায়মান পিঁপড়াদের এ কথা শুনে হেসে ফেলেন।

মোট কথা, হয়তো আমাদের দৃষ্টিতে পশুপাখিরা অবলা এবং বাকশক্তিহীন। কিন্তু তারাও তাদের নিজ প্রজাতির সাথে কথা বলে থাকে, এমনকি আল্লাহর যিকিরও উচ্চারণ করে থাকে।

[১] হাওয়াছছে আসরার অমিয-এ হাইওয়ানাত, পৃ. ১২৫;

পিতা-মাতার মর্যাদা ও তাঁদের সাথে সদাচরণের গুরুত্ব

সরকার ওয়াসি আহম্মেদ

পিতা-মাতা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের জন্য বিশেষ রহমত। তাঁদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে। শিশুর জন্মের পর থেকেই পিতা-মাতা দিনরাত অনেক কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে লালন-পালন করেন– তাদেরকে বড় করে তোলেন। তাঁরা সবসময় সন্তানদের কল্যাণ কামনা করেন এবং সন্তানদের সুখের জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। মহান আল্লাহ পিতা-মাতাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে ধন্য করেছেন। আর তিনিই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার এবং তাঁদের প্রতি বিনম্র হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন : তোমার প্রতিপালক নিশ্চিত বিধান প্রদান করেছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচার করবে; যদি তাদের মধ্যে একজন বা উভয়েই তোমার সম্মুখে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ্' (ন্যূনতম অসম্মানজনক কথা) পর্যন্ত বলবে না, আর তাদেরকে ধমক দিয়ে (ও ভর্ৎসনা করে) তাড়িয়ে দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানসূচক (মমতাপূর্ণ) কথা বলবে। আর তাদের সম্মুখে বিনয়-নম্র হয়ে নিজের কাঁধ নত করে দেবে এবং বলবে (তাদের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে), 'হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি করুণা কর, যেরূপে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।'– সূরা বনি ইসরাইল : ২৩-২৪

সন্তানদের জন্য পিতা-মাতা, বিশেষ করে মাতা যে কষ্ট সহ্য করেন তার কোনো তুলনা হয় না। এ কারণেই মহান আল্লাহ পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছি। (এজন্য যে,) তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধপান ছাড়াতে (আরও) দু'বছর অতিক্রান্ত হয়; সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।– সূরা লুকমান : ১৪

ইমাম আলী ইবনিল হোসাইন যাইনুল আবেদীন (আ.) সন্তান জন্মদান ও তার প্রতিপালনে মায়ের ভূমিকাকে চমৎকারভাবে তুলে ধরে তাঁকে মর্যাদা দানের ব্যাপারে বলেন : ...'সে তোমাকে এমন স্থানে বহন করেছে, যেখানে কেউ কাউকে বহন করে না। আর তার হৃদয়ের ফল থেকে তোমার খাবার যুগিয়েছেন যা কেউ কাউকে খাওয়ায় না। সে তোমাকে তার কান দ্বারা, চোখ দ্বারা, হাত, পা ও চুল দ্বারা এবং তার আপাদমস্তক ও সমুদয় অঙ্গ দ্বারা রক্ষা করেছে। আর এসব আত্মত্যাগের দ্বারা উৎফুল্ল ও আনন্দিত থেকেছে। আর যে কোনো দুঃখ-যন্ত্রণা ও কষ্টকে বরণ করে নিয়েছে ও তোমার থেকে সেগুলোকে প্রতিহত করেছে। এরপর তোমাকে পৃথিবীতে এনেছে এবং তোমাকে পরিতৃপ্ত করে সে ক্ষুধার্ত থেকেছে, তোমাকে কাপড়ে আবৃত করে বিবস্ত্র থেকেছে, তোমার পিপাসা মিটিয়ে সে তৃষ্ণার্ত থেকেছে, তোমাকে ছায়ায় রেখে সে সূর্যের নিচে থেকেছে, নিজে কষ্ট স্বীকার করে তোমাকে নেয়ামতের মধ্যে রেখেছে, নিজে অনিদ্রায় থেকে তোমাকে ঘুম পাড়িয়েছে; তবুও সে আনন্দিত থেকেছে। তার পেট ছিল তোমাকে ধারণ করার পাত্র, আর তার আঁচল হলো তোমার নিরাপদ বিশ্রামাগার, তার স্তন ছিল তোমার পানির মশক, আর তার জীবন ছিল তোমার জন্য উৎসর্গিত। তোমার কারণেই এবং তোমার জন্যই সে প্রকৃতির শীত ও গরমকে সয়েছে। তাই তাকে এই পরিমাণে মর্যাদা দেবে। আর তা পারবে না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাওফিক ছাড়া।'

ইমাম যাইনুল আবেদীন (আ.) পিতার অধিকার প্রসঙ্গে বলেন : 'আর তোমার পিতার অধিকার হলো এটা জানবে যে, সে হলো বৃক্ষকাণ্ড আর তুমি তার শাখাস্বরূপ। আর জেনে রাখবে, সে যদি না থাকত তাহলে তুমি থাকতে না। কাজেই যখনই নিজের মধ্যে এমন কিছু পাবে যা দেখে তোমার ভালো লাগে, জানবে যে, সেটা তোমার পিতার থেকে। আর আল্লাহকে তত পরিমাণ কৃতজ্ঞতা জানাবে।'

পিতা-মাতার সেবা করা

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! মানুষের মাঝে আমার নিকট থেকে সর্বোত্তম সেবা লাভের অধিকার কার?' নবী (সা.) বলেন : 'তোমার মায়ের।'; লোকটি পুনরায় জানতে চাইলেন : 'তারপর কার?' তিনি বললেন : 'তোমার মায়ের।' লোকটি পুনরায় জানতে চাইলেন : 'তারপর কার?' তিনি বললেন : 'তোমার মায়ের।' লোকটি আবারও জানতে চাইলেন : 'তারপর কার?' তিনি বললেন : 'তোমার পিতার।'– সহীহ আল-বুখারী

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের প্রতিদান

সন্তানরা যদি পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তাদেরকে আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দেবেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী, আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন তা হচ্ছে– 'আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং যার প্রতি তার পিতা-মাতা সন্তুষ্ট, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।'

অপর একটি রেওয়ায়াতে এসেছে যে, হযরত মূসা (আ.) একদিন আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করার সময় এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আমার রব! এই ব্যক্তি কে, যে, তোমার আরশ তার ওপরে ছায়া ফেলেছে?' আল্লাহ্ বললেন : 'এ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে তার পিতা ও মাতার কল্যাণ করেছে এবং সে চোগলখুরি করে নি।'– আল-আমালী, শেইখ সাদূক, পৃ. ১৮০

ইমাম বাকের (আ.) এরশাদ করেন : 'চারটি গুণ যে কোনো মুমিনের মধ্যে থাকবে আল্লাহ্ তাকে বেহেশতের সমুন্নততম স্তরে সর্বোত্তম কক্ষসমূহের একটিতে ও সমুন্নততম স্থানে জায়গা দেবেন... যে ব্যক্তি তার পিতা ও মাতাকে দান করবে, উভয়ের সাথে খাপ খাইয়ে চলবে, তাদের কল্যাণ করবে এবং তাদের মনে আঘাত দেবে না।'– আল-আমালী, শেইখ মুফীদ, পৃ. ১৬৭

পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণের ক্ষতি

পিতা-মাতাকে অসম্মান করা ও তাঁদের সামান্যতম ক্ষতিসাধন থেকেও সন্তানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন: 'পিতামাতার প্রতি অন্যায় করা থেকে বিরত থাক। কারণ, বেহেশতের ঘ্রাণ হাজার বছরের পথের দূরত্ব থেকে নাকে এসে পৌঁছে, কিন্তু পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তির কাছে তা পৌঁছে না।'– আল-কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯

একখানা হাদীসে কুদ্সী অনুযায়ী, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন : 'আমার ইজ্জত, প্রতাপ ও শা'নের শপথ, পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি যদি সমস্ত নবী-রাসূলের ইবাদতও আঞ্জাম দেয় তথাপি তার কাছ থেকে আমি তা কবুল করব না।'– জামেউস সাআদাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭১

ইমাম জাফর সাদেক (আ.) এরশাদ করেন : 'কারো পিতামাতা যদি তার প্রতি অন্যায় আচরণও করে থাকে, এমতাবস্থায় সে পিতা-মাতার প্রতি ক্রুদ্ধভাবে তাকালে আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না।'– আল-কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯

পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহারের পরকালীন শাস্তি ছাড়াও বিভিন্ন পার্থিব ক্ষতিও রয়েছে। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) এরশাদ করেন : 'পিতা-মাতাকে কষ্টদানের পার্থিব পরিণতিসমূহের অন্যতম হচ্ছে দোআ কবুল না হওয়া...'– আল-কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৮

হযরত ইমাম হাদী (আ.) এরশাদ করেন : 'পিতামাতার অবাধ্যতা দুনিয়ার বুকে (পরিবারের লোকসংখ্যা) হ্রাসের (ও মৃত্যুর), লাঞ্ছনার ও অপদস্থ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে।'– বিহারুল আনওয়ার, ৭১তম খণ্ড, পৃ. ৮৪

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাঁদের প্রতি কল্যাণ সাধন

পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তো বটেই, এমনকি তাঁদের মৃত্যুর পরেও তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও কল্যাণ সাধনের জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন।

ইমাম বাকের (আ.) এরশাদ করেন : 'কেউ যদি পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের উভয়ের প্রতি কল্যাণ সাধন করে থাকে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর তাদের ঋণ পরিশোধ না করে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করে তাহলে আল্লাহ তাকে পিতামাতার অবাধ্য হিসেবে গণ্য করবেন।'– আয-যুহদ, পৃ. ৩৩

হযরত ইমাম রেযা (আ.) পিতার জন্য দু'আ করার জন্য নসীহত করতে গিয়ে এরশাদ করেন : 'রেওয়ায়াত হয়েছে যে, যে কেউ পিতার জীবদ্দশায় তার প্রতি কল্যাণ করেছে, কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোআ করে নি, আল্লাহ তাকে 'স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী' হিসেবে অভিহিত করবেন।'– ফিকহুর রেযা (আ.), পৃ. ৩৩৪

সুতরাং প্রত্যেক সন্তানের উচিত পিতা-মাতার মর্যাদা ও অধিকারের ব্যাপারে মনোযোগী ও সতর্ক থাকা, সর্বাবস্থায় তাঁদের সাথে উত্তম আচরণ করা এবং যদি তাঁদের আদেশ-নিষেধ ধর্মবিরোধী না হয় তবে তা মেনে নেওয়া। আর কোনো অবস্থাতেই পিতা-মাতার সাথে মন্দ আচরণ করা উচিত নয়। কেবল তাহলেই তারা পৃথিবীতে যেমন আনন্দে জীবন যাপন করতে পারবে তেমনি তাদের পরকালীন জীবনও সৌভাগ্যমণ্ডিত হবে।

বিচক্ষণ বিচারক

মূল : মাহ্‌দি অযার ইয়ায্‌দি
অনুবাদ : আব্দুর রঊফ সালাফী

অনেক দিন আগের কথা। এক ব্যক্তি একজনকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা ধার দিয়েছিল, কিন্তু কোনো চুক্তিপত্র করে নি। যখন সে টাকা ফেরত চায় তখন ঋণগ্রহীতা অস্বীকার করে বলে : 'কিসের হিসাব? কোন্ বইয়ে আছে?' নিরুপায় হয়ে পাওনাদার বিচারকের কাছে অভিযোগ করে। বিচারক ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করে বলেন : 'এই লোকের কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছো তা দিচ্ছ না কেন?'

ঋণগ্রহীতা বললো : 'আমি কোনো টাকা নিইনি। সে মিথ্যা কথা বলছে। সে আমার সম্মান নষ্ট করতে চায়।' বিচারক এদের দুজনকে বিচারের জন্য তাঁর উর্ধ্বতন বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দেন।

বিচারক বললেন : 'তোমাদের অভিযোগ বলো।' একজন তার পাওনা টাকার কথা বললো আর অন্যজন তা অস্বীকার করলো।

বিচারক বললেন : 'একজন পাওনাদার আর অন্যজন অস্বীকারকারী। শরীয়তের আদেশমতে পাওনাদারের অবশ্যই সাক্ষী থাকতে হবে আর যে অস্বীকার করবে তাকে কসম করতে হবে।'

অতঃপর পাওনাদারকে বললেন : 'তোমার কোনো সাক্ষী আছে যে বলবে এই লোক টাকা নিয়েছে?' পাওনাদার বললো : 'না, সাক্ষী নেই।'

বিচারক বললেন : 'তাহলে কোনো উপায় নেই। অবশ্যই অভিযুক্ত কসম করুক। যদি কসম করে বলে টাকা নেয়নি তাহলে আর কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু অপরাধীরা আল্লাহকে ভয় পায় এবং মিথ্যা কসম করে না। কারণ, একদিন সত্য ফাঁস হলে অপমান ও শাস্তি তার উপর বোঝা হয়ে আসবে।'

পাওনাদার এ কথা শুনে দুঃখ পেয়ে কান্নাকাটি করে এবং অনুরোধ করে বলে : 'এই কাজ করবেন না। এই লোকের কসমের প্রতি কোনো বিশ্বাস নেই। সে মিথ্যা কসম করবে। এতে আমার অধিকার পদদলিত হবে। অন্য উপায় বের করে একটি সমাধান করুন।'

বিচারক বললেন : 'তুমি বলছো তোমার কোনো সাক্ষী নেই আর আমিও তো গায়েব জানি না। কিন্তু টাকা ধার দেওয়ার ঘটনাটা তার সামনেই বলো। দেখি, সত্য ঘটনা বের হয় কিনা।'

পাওনাদার বললো : "ঘটনা হলো আমরা কয়েক বছর ধরে পরস্পরের বন্ধু ছিলাম। আমি তার মধ্যে কোনো অসৎ কাজ দেখিনি এবং সে খুব গরিবও ছিল না। বাড়ি, বাগান ও জমানো পুঁজি ছিল। হঠাৎ বিবাহের প্রস্তাব পেয়ে একটি জায়গায় যায়। এক সপ্তাহ পরে তার বিবাহের দিনক্ষণ ঠিক হয়। মেয়েটির আরো বিবাহের প্রস্তাব ছিল। ঐ দিনগুলোতে আমার বন্ধু প্রেমাসক্ত, অস্থির ও চিন্তিত হয়ে থাকতো। আমরা একদিন এক বনে ঘুরতে যাই। আমরা একা ছিলাম, এক জায়গায় বসে ছিলাম। সে তার অবস্থা খুলে বলে। বলে : 'আমার কাছে নগদ টাকা নেই। গ্রামে এক টুকরা জমি আছে, কিন্তু সেটা বিক্রি করে বিবাহের খরচ জোগাড় করবো সেই সময়টুকুও নেই।' আমি এই কথাগুলো শুনে চিন্তায় পড়লাম, তার জন্য আমার কষ্ট লাগলো। দুনিয়ার সম্পদ বলতে আমার সেই ১০০ স্বর্ণমুদ্রা। আমি কোনো কিছু না ভেবেই তাকে বললাম : 'হে বন্ধু, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমার কাছে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা আছে, কিন্তু সেটাই আমার একমাত্র সম্বল। যদি তা তোমাকে ধার দিই তাহলে কতদিন অপেক্ষা করবো?' সে বললো : 'এক মাস পর্যন্ত।' আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ও দোয়া করে কথা দিল এক মাসের মধ্যে ঐ জমি বিক্রি করে টাকা ফেরত দেবে। আমি তাকে ঐ নগদ টাকা দিলাম আর সে তার কাজ সমাধা করলো। এক মাস, দু'মাস, এক বছর, দু'বছর চলে গেল। আমি আমার কাজ করতাম, টাকার ব্যাপারে কোনো কথাই বলতাম না। সেও কোনো কথা বলতো না। আমি খেয়াল করলাম তার কাছে তখনও কোনো টাকা ছিল না, কিন্তু এক সপ্তাহ পূর্বে সে ঐ জমিটি ভালো দামে বিক্রি করেছে। আমি জানতাম তার কাছে নগদ টাকা রয়েছে। একদিন আমি তাকে ঐ ১০০ স্বর্ণমুদ্রার কথা বললাম আর সে অন্য কথা বলে কাটিয়ে দিল। এতে আমার সন্দেহ হলো। আমি পরিপূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলতেই সে অস্বীকার করে বললো : 'কিসের হিসাব, কোন্ বইয়ে আছে, কিসের টাকা?' যখন দেখলাম তার সম্পর্কে ভালো ধারণা করাটা আমার ভুল ছিল, নিরুপায় হয়ে বিচারকের কাছে অভিযোগ করলাম। এটাই ছিল আমাদের ঘটনা।"

বিচারক বললেন : 'যেদিন তাকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলে সেদিন কোথায় বসেছিলে?' বললো : 'আমরা এক গাছের নিচে বসেছিলাম, সেখানে নদীভরা পানি ছিল আর জায়গাটিও ছিল খুবই মনোরম।' এ পর্যন্ত বলার পর বিচারক ঋণগ্রহীতাকে বললেন : 'এই ঘটনা কি সত্য?' সে বললো : 'পুরাটাই মিথ্যা।'

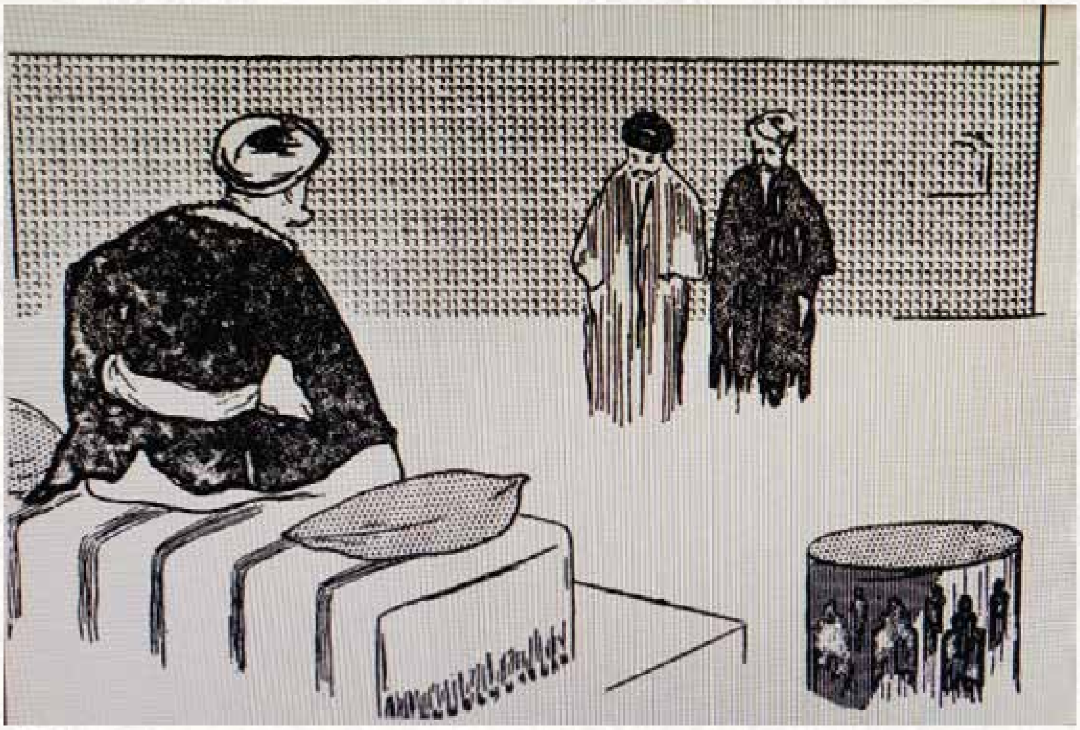

বিচারক আরো কয়েক পৃষ্ঠা বই পড়ে ফিসফিস করে বললেন : '(এই বিচারের) মানসিকতাই নষ্ট হয়ে গেলো, এই লোকটি গেলো আর ফিরে আসলো না। আমার মনে হয় অনেক দূর, তাই সে নিরুপায় হয়ে রাগ করেছে।' তারপর আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন : 'তোমার বন্ধু কি এতক্ষণে ঐ গাছের কাছে পৌছে গেছে? তোমার কী মনে হয়?'

লোকটি দ্রুত জবাব দিলো : 'এখনো না, জনাব।' বিচারক কোনো কথা না বলে আবার বই পড়ায় ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেক পরে বাদী মন খারাপ করে ফিরে এসে বললো : 'জনাব, সেখানে গিয়েছিলাম, আপনার সালাম দিলাম, আপনার সীলমোহর দেখালাম, আপনার কথাও গাছকে বললাম, কিন্তু গাছ কোনো উত্তরই দিলো না। আমি অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বসেছিলাম, কিন্তু সে তার জায়গা থেকে নড়লো না। তাই আমি ফিরে এলাম। এই নিন আপনার মোহর। এখন কী করা উচিত?'

বিচারক বললেন : 'হঠাৎ গাছ এসে তার সাক্ষ্য দিয়ে চলে গেছে।' তারপর আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন : 'হে অত্যাচারী, নিজের বন্ধুর কাছ থেকে যে টাকা ধার নিয়েছিলে তা দিয়ে দাও নতুবা আমি তোমাকে প্রধান বিচারকের কাছে পাঠাবো। কীভাবে টাকা আদায় করতে হয় তা তিনি ভালো করেই জানেন।'

ঐ লোকটি বললো : 'হে জনাব, কেন অবিচার করছেন? আমি তো এখানেই আছি, কোনো গাছ এসে তো সাক্ষ্য দেয়নি।'

বিচারক বললেন : 'যখন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম লোকটি গাছের কাছে পৌছেছে কি না তখন তুমি বললে যে, সে এখনো গাছের কাছে পৌছে নি। তুমি নিজেই বাদীর সাক্ষ্য দিয়েছো। যদি কোনো হিসাব, ঐ গাছ ও সাক্ষীর ব্যাপার না থাকতো তা হলে বলতে : 'কোন্ গাছ? বাদী কোথায় গেছে জানি না।' আর তুমি বলেছিলে, বাদীর সব কথাই মিথ্যা। তাহলে কিভাবে ঐ গাছ চিনলে?'

আসামী লজ্জিত হলো। সে নিরুপায় হয়ে বিচারকের কথা মেনে নিলো এবং ঋণের টাকা পরিশোধ করলো।

বিচারক ঋণদাতাকে বললেন : 'তুমি যখন বলছো গাছের নিচে বসে টাকা দিয়েছিলে তাহলে কেন বলছো সাক্ষী নেই? ঐ গাছটিই তো সাক্ষ্য দেবে।' বাদী বললো : 'গাছ কিভাবে সাক্ষ্য দেবে?'

বিচারক বললেন : 'আমি যেভাবে বলছি সেভাবে কাজ কর। এখানে আমি আসামীকে আটকে রাখছি। তুমি এখন ঐ গাছের কাছে গিয়ে আমার সালাম দাও এবং বলো, বিচারক বলেছেন এসে সাক্ষ্য প্রদান করতে।' এই সময় আসামী কথাগুলো শুনে উপহাস মনে করে মুচকি হাসি হাসলো। বিচারকও তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। বাদী বিচারককে বললো : 'আমার ভয় হচ্ছে, আমি গাছকে এ কথা বললে গাছ হয়তো বিশ্বাস করবে না।'

বিচারক বললেন : 'এসো, আমার নাম লেখা এই সীলমোহর নাও এবং গাছকে দেখিয়ে বলো যেন তোমার সাথে চলে আসে।' বাদী বিচারকের সীলমোহর নিয়ে গাছের কাছে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হলো। বাদী বের হয়ে গেলে বিচারক বই পড়া শুরু করলেন। অতঃপর নরম স্বরে আসামীর সাথে কথা বলা শুরু করলেন।

তিনি বললেন : 'বাজারের পরিস্থিতি ভালো নয়।'

ঐ লোকটি বললো : 'হ্যাঁ, কাজ-কর্মে মন্দা চলছে।'

বিচারক বললেন : 'মানুষের ঝগড়া করারও মেজাজ নেই। আমরাও প্রায়শই বেকার, বসে থাকি, বই পড়ি। আসলে বলতে চাচ্ছি আমাদের কাজেও মন্দা।' আসামীও এক্ষেত্রে কিছু কথা বললো। বিচারকের কথা বলা দেখে মনে মনে ভাবলো তিনি হয়তো ঘুষ নিয়ে তাকে কসম করিয়ে বিষয়টি ফয়সালা করে দেবেন। সে ভেবেছে বিচারক বাদীর সাথে উপহাস করেছেন। আস্তে আস্তে তার ভয়ও ভেঙ্গে গেল।

অশ্রুর অস্ত্র, শোকের শক্তি

মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান

অশ্রু দিয়েই পেলেন ক্ষমা নবী আদম শেষে,
নূহের নামটি নূহ হয়েছে অশ্রুনদে ভেসে।

ইব্রাহীমের অশ্রুকণা নেভায় আগুন শোনো,
ইয়াকুব নবীর অশ্রু ঝরে বাঁধ মানে না কোনো।

ইউনুস নবীর মুক্তি মেলে- অশ্রু সাথে দোয়া,
ঈসা নবীর উর্ধ্বে গমন অশ্রু দিয়ে ছোঁয়া।

মূসার হাতে লাঠির চেয়েও অশ্রু বেশি বল,
সুলাইমানের আংটি বলে ঝরাও অশ্রুজল।

অশ্রু দিয়ে যুদ্ধ জেতেন দাউদ-তালুত সেনা,
অশ্রু দিয়ে খিজির বাঁচেন, আর তাঁকে যায় চেনা।

জরা কালে পুত্র পেলেন জাকারিয়া কেঁদে,
ইয়াহইয়া তাঁর শহীদ হলেন অশ্রুশোকের ভেদে।

ইদ্রিস নবী অশ্রু বলে মারুফ হলেন জ্ঞানে,
শীষ নবী তাঁর সহিফা পেলেন অশ্রুপ্রেমের ধ্যানে।

হূদের দোয়া, অশ্রু বলে মূর্তি ধসে পড়ে,
অশ্রু দাওয়ায় এত রাসূল ইসহাক নবীর ঘরে,

অশ্রু দিয়েই লড়েন হারুন তুর সিনিনের ধারে,
শুয়াইব নবীর কওম ধ্বংস তাঁরই অশ্রু ভারে।

অশ্রুস্রোতে ভেসে আসে ইসমাইলের নহর,
লূত নবীর অশ্রু গুণে দূর হয়ে যায় কহর।

সালেহ নবী অশ্রু দিয়ে সৃষ্টি করেন উট,
সারাহ বিবির মানকে অশ্রু দেয় নি হতে লুট।

ইলিয়াস নবী আজও বাঁচেন অশ্রু রিযিক দিয়ে,
উযাইরের রাজাত যেন অশ্রু তাঁরই পিয়ে।

শামায়ুনের অশ্রু জাহিল, বাতিল করে নাশ,
ইউশা ইবনে নুনের বিজয় অশ্রু জলোচ্ছ্বাস।

মাসীহর খবর ইমরান তাঁর অশ্রু চোখে দেন,
আইয়ুব নবী অশ্রুধারায় ধৈর্য শিক্ষা নেন।

ইউসুফের অশ্রু করে অন্ধ কুয়া জয়,
দানিয়ালের অশ্রু গুণে নাই দেহ তাঁর ক্ষয়।

আল ইয়াসা শ্রেষ্ঠ হলেন অশ্রু করে পাত,
যুলকিফলের সবর বাড়ায় অশ্রুমাখা হাত।

আসিয়ারই অশ্রু তাঁকে সাহস জোগায় চাপে,
হাজার বিবির অশ্রুনাদে পাহাড়, মরু কাঁপে।

মারইয়ামের অশ্রু জোরে শিশু কথা কহে,
আল-এ-নবীর অশ্রুপ্রেমে আজও ফোরাত বহে।

আসাদ সুতার অশ্রু ভাঙ্গে ক্বাবার দেয়াল ঘাতে,
আবুল ফজল অশ্রু ঝরান, বীর হয়েছেন তাতে।

আবদুল্লাহ আর আমিনারই অশ্রু আনে নবী,
আবু তালিবের অশ্রু যেন দ্বীন হাফেজের ছবি।

খাদিজারই আঁতুড়ঘরে অশ্রু কারামাত,
হামযা, জাফর হলেন শহীদ গেয়ে অশ্রু নাত।

সাজ্জাদেরই অশ্রু দেখে জাগে পাষাণ দিল,
নবীর দাদার অশ্রুবানে ধ্বংস হলো ফিল।

আলীর চোখের অশ্রুবানে যায় যে থেমে ঝড়।
হাসান, হুসাইন অশ্রু দিয়ে বাঁচান খোদার ঘর।

ফাতিমারই অশ্রু গড়ে কাউসারেরই ধারা,
যাইনাব তাঁর অশ্রুসহ রোপন করেন চারা।

রাসূল ঝরান অশ্রু তাঁরই হুসাইন শহীদ হবে,
অশ্রু ছাড়া দ্বীনের পথে কে জেগেছে কবে?

অশ্রু, প্রেমে হলেন সফল সকল ইমাম, নবী,
অশ্রু ছাড়া প্রেমের রাহে কেমনে সফল হবি!

অশ্রু দিয়েই তওবা কবুল, অশ্রু দিয়েই জয়,
অশ্রু ঝরান যাঁরা, তাঁদের নেই কখনও লয়।
অশ্রু দিয়েই পারে মানুষ খোদার দিকে যেতে,
অশ্রু, প্রেমে থাকেন সকল মহামানব মেতে।

অশ্রু দিয়ে হুসাইন তোমায় সালাম জানাই হে,
রক্তে ভেজা তোমায় দেখে হায় কাঁদে না কে?
নবীর আশেক অশ্রুজলে স্মরণ তোমায় করে,
তোমার বাণী পৌঁছে দিতে কাঁদেন সমস্বরে...।

মানুষের মতো মানুষ

শাবলু শাহাবউদ্দিন

মানুষের মতো মানুষ হতে কী কী লাগে মা ? (সন্তান)
শিক্ষা-দীক্ষা মনুষ্যত্ব লাগে রে বাবা। (মা)
শিক্ষা-দীক্ষা মনুষ্যত্বের কে বা মূল্য দেয়? (সন্তান)
দিক বা না দিক, হই পরকালের কল্যাণ। (মা)

মানুষ হয়ে মনুষ্যত্ব আবার কেন মা? (সন্তান)
মানব দেহে পশু আত্মা না দেয় যেন পা। (মা)
শিক্ষা-দীক্ষা না থাকলে কী বা ক্ষতি হয়? (সন্তান)
জগৎটাকে চেনার বাবা কোনো উপায় নাই। (মা)

আলো জ্বালাও জগৎ জুড়ে, তিমির কর দূর
বিশ্ব জুড়ে কপোত উড়াও, দুঃখ কর দূর
শান্তি আনো ঘরে ঘরে, অভাব হবে দূর
মানুষের মতো মানুষ হও, নষ্ট কর না সুর।

আশার আলো প্রদীপ জ্বালাও, যুদ্ধ কর দূর
মানুষ হয়ে মানুষ চেন, মানবপ্রেমে ফুটাও তুমি
দিবা-রাত্রির ফুল॥

শরৎ তোমায় লিখছি

মোঃ আনোয়ারুল আজম মিঠু

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে
যায় দিন যায় চলে,
এক্ষুণি কি ফুটলে ফুল হয়ে তুমি
হেমন্ত শেষে এই শরতে?

তোমার অবয়ব দেখে হৃদয় জুড়ালো
হারিয়েছি তোমাতে আমি,
তুমি ছাড়া চলে না একটি দিনও
এতটুকু বৃষ্টির জলে হৃদয় জুড়ালো
আজ শরতের এই মিষ্টি আহ্বানে।

কাশফুল, ঘাসফুল ফুটে আছে থরে থরে
তোমার আমার মিলন হলো বুঝি
শরতের এই শান্ত বিকেলে,
এসো! এসো! ভালোবেসে হে শরৎ
আমার হৃদয়ের আঙ্গিনায়।